গল্পের ভুবন

রমাপদ চৌধুরী

নীহার শুভ্র অধিকারী

পুনশ্চ

॥ সূচি ॥

উপক্রমণিকা ১৩

প্রথম অধ্যায় :

রমাপদ চৌধুরীর গল্পকার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় :

রমাপদ চৌধুরীর গল্পে আদিবাসী-কোলিয়ারি জীবন ৫৯

তৃতীয় অধ্যায় :

রমাপদ চৌধুরীর গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন ৯৫

চতুর্থ অধ্যায় :

রমাপদ চৌধুরীর গল্পের আঙ্গিক ১৬১

পঞ্চম অধ্যায় :

রমাপদ চৌধুরী ও সমসাময়িক গল্পকার ১৯৭

উপসংহার ২৫৭

পরিশিষ্ট -১ : সাক্ষাৎকার ২৬৪

পরিশিষ্ট -২ : চিত্রাবলি ২৭৫

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পঞ্জিকাপঞ্জি ২৭৯

॥ ভূমিকা ॥

রমাপদ চৌধুরীর ছোটোগল্প নিয়ে নীহার শুভ্র অধিকারী যে সুবৃহৎ গবেষণা করেছেন তার পরিমার্জিত রূপ হল এই বই। ইতিপূর্বে কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীকে নিয়ে অত্যন্ত উন্নত মানের একটি প্রয়াসকে দেখার সৌভাগ্য অনেকের মতো আমারও হয়েছে। এখানে আমি স্পষ্ট বলে নিতে চাই, পূর্বের গবেষণা কিংবা এই সম্পর্কিত আরো কিছু পূর্ববর্তী আলোচনাকে এই বই অতিক্রম করে গেছে—একথা আমি কখনোই বলতে চাই না অথবা এমন বলাটা আমার উদ্দেশ্যও নয়। বলতে চাইছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও রমাপদ চৌধুরীর সৃষ্টিকর্ম বিষয়ক আলোচনা—বিশেষত ছোটোগল্প সম্বন্ধীয় আলোচনা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না কখনো। রমাপদ চৌধুরীর ছোটোগল্প বলতে বিশেষ এক ধরনের গল্প (যেমন—দরবারী, রেবেকা সোরেনের কবর, আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া) কিংবা একেবারে অন্য ধরনের (যেমন—ভারতবর্ষ, বুকের মধ্যে ভূমিকম্প, প্রদত্তার নগ্নদেহ) বেশ কিছু বাছাই করা গল্প নয়, বরং সমস্ত গল্প (আনুমানিক সংখ্যা ১৪৪) মিলে এক দীর্ঘ বিস্তৃত কালসীমায় (১৯৪০-১৯৮৫) বিধৃত জীবনের—বিশেষত আদিবাসী কোলিয়ারি জীবন ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা পালাবদল বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। এই সঙ্গে লক্ষণীয়, ব্যক্তিমানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বা প্রাতিস্বিক ইতিহাস ('personal history')-ই নয়, তার সামাজিক ইতিহাস ('a man with a social history'), সেই সঙ্গে সমাজের মনের গড়ন ও ঘাতপ্রতিঘাতসহ তার দ্বান্দ্বিক স্বরূপ অনুসন্ধান এই গবেষকের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে আরো, এই বইয়ের 'গল্পকার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত' অধ্যায়টি বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষক নীহার শুভ্র পূর্ববর্তী গবেষকদের পরবর্তী হওয়ায় অনেক বেশি তথ্য সহযোগে একে যথাযোগ্য বিস্তার দিতে পেরেছেন। আর 'গল্পের আঙ্গিক' বিষয়ে আমার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হলেও আমি বলতে পারি, তাঁর এমন আলোচনার ক্ষেত্রটিও আকর্ষণীয়। তবে এই বইয়ের অতিরিক্ত প্রাপ্তি 'রমাপদ চৌধুরী ও সমসাময়িক অন্যান্য ছোটোগল্পকার' নামক অধ্যায়টি। গ্রন্থকার এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিশাল ক্ষেত্রটিকে সংহত রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন। আমার মতে একে স্বতন্ত্রভাবে আরো একটি বইও করা যেত। যাই হোক, বাংলা আলোচনার প্রসার্যমাণ ক্ষেত্রে এই বই সমাদরণীয় হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অতনু শাশমল
বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

রমাপদ চৌধুরীর গল্পকার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

রমাপদ চৌধুরী এ যুগের অন্যতম লেখক। বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য কর্ম। লেখক রমাপদ চৌধুরী 'ঋষি' দস্যু, এক কিশোর বালক' রচনায় নিজের সঙ্গে নিজের সংলাপে তাঁর বেড়ে ওঠা এবং হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তটি জানিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর লেখক জীবন সম্পর্কে জানা যায় আরো কয়েকটি টুকরো গদ্য রচনায়—'গল্প লেখা, গল্প পড়া', 'বোম্বাই ভ্রমণ', লেখালিখি ইত্যাদি। এই রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'লেখালিখি' প্রকাশিত হয়েছিল 'ত্রিবেণী প্রকাশন' কলকাতা, ১লা বৈশাখ (সাল জানা যায় না)। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শ্রী ক্ষিতীশ সরকারকে, প্রচ্ছদ করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। 'আমরা সবাই' প্রকাশিত হয়েছিল 'শৈব্যা পুস্তকালয়' থেকে, ডিসেম্বর ১৯৮০তে। এটির প্রচ্ছদ করেছিলেন অমিয় ভট্টাচার্য। আর 'রূপবাণী' নামক একটি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থের কথা জানা যায়। এটির প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৬৩, প্রকাশনা: সরস্বতী গ্রন্থালয়, প্রচ্ছদ করেছিলেন অর্ধেন্দু দত্ত, উৎসর্গ করা হয়েছে অরবিন্দ গুহ কে।[১]

রমাপদ চৌধুরীর প্রায় হারিয়ে যেতে বসা স্মৃতিকথাগুলি দুই মলাটের মধ্যে এনে 'এবং মুশায়েরা' থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে 'গদ্য সংগ্রহ'। এই বইটির ভূমিকায় রমাপদ চৌধুরী জানিয়েছেন :

> *'আমরা সবাই' এবং 'লেখালিখি' পৃথক বই হিসেবে ছাপা হয়েছিল প্রায় ৫০ বছর আগে। লেখাগুলির মধ্যে এমন লেখাও আছে যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তারও ৫/১০ বছর আগে। বলতে গেলে বই দুটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সঞ্জয় সামন্তের উদ্যোগে এতদিন পরে দুটি বই-ই আবিষ্কৃত হল।*[২]

'গদ্য সংগ্রহ'-এর ভূমিকাটি রমাপদ লিখেছেন ২.১.২০১১ তারিখে। লেখকের নিজের কথা অনুযায়ী রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর কিংবা তারও পাঁচ-দশ বছর আগে। অর্থাৎ গত শতাব্দীর পাঁচ কিংবা ছয়ের দশকে। তবে সূত্র পাওয়া যাচ্ছে 'আমরা সবাই' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৮০ তে।

সাম্প্রতিক কালে 'দেশ' পত্রিকায় ২ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে মোট ১৮টি পর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'হারানো খাতা' নামক আত্মজীবনী মূলক রচনা। এই রচনায় জীবনের প্রায় অপরাহ্ন বেলায় রমাপদ তাঁর ফেলে আসা সময়কে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। তার সমগ্র জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এখানে যে

ভাবে উঠে এসেছে, তাতে তাঁর লেখক সত্তার সামগ্রিক অভিজ্ঞান নিহিত। এই রচনাটি নানাবিধ কারণেই তাঁর লেখক সত্তার পরিচয় লাভে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রমাপদ চৌধুরীর জন্ম ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২। বাংলা সাহিত্য তখনো রবীন্দ্রনাথের অমোঘ প্রভাবে সম্মোহিত :

> *রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মাত্র ন'বছর পরেই আমার জন্ম, তখনও তিনি রবি ঠাকুর।*[৩]

আর ১৯২৩-এ বেরিয়েছে 'কল্লোল' পত্রিকা।[৪] তাঁর জন্মের এক বছর পরেই। তরুণ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে তখনই। ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খ্রিঃ)। ১৯১৭ তে রাশিয়ার জারতন্ত্রের পতন ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে চুঁইয়ে পড়ছে সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা। ইতিহাসের এই উত্তালপর্বে জন্মেছেন রমাপদ চৌধুরী।

রমাপদ-র শৈশব কেটেছে রেলশহর খড়্গপুরে। এই খড়্গপুর তৎকালীন ব্রিটিশের বেনিয়া এবং বন্দর নগরী কলকাতা নয়, বাংলার সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম সমাজও নয়। এ এক স্বতন্ত্র্য রেলনগরী—

> *শহরটার নাম খড়্গপুর, সেকালের বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান শহর। রেলের পাঁচিলঘেরা বিশাল কারখানা ঘিরেই রেলশহরটি গড়ে উঠেছিল। আমি নিজেই একসময় ভেবে অবাক হতাম, আমরা এ শহরে এলাম কেন, এলাম কী কারণে? কলকাতায় নয় কেন? প্রথম দিকে বাঙালির গন্তব্য ওই একটা শহর। ছোটলাট-বড়লাট সব তো ওখানেই! তাছাড়া কলকাতা ব্রিটিশ বাণিজ্যের কেন্দ্র।*[৫]

এই শহরে বেড়ে ওঠার কারণেই তাঁর মনের মধ্যেও এক স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে উঠেছিল।

রমাপদ-র পিতা তারাপ্রসন্ন চৌধুরী ছিলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলের সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট, পরে চিফ্ অ্যাকাউন্টস অফিসার। তাঁর মাতামহ ১৮৭৯ সালে রেলে দোভাষীর চাকরি পান। ছত্তিসগড় শ্রমিকদের ভাষা ইংরেজিতে তরজমা করে সাহেবদের শোনানো আর সাহেবদের ইংরেজি হুকুম শ্রমিকদের বোঝানো,—এই ছিল তাঁর কাজ। লেখকের মাতামহ দোভাষীর কাজ ছেড়ে রেল-ইস্কুলের হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত হন। খড়্গপুর বি.এন. হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম হেডমাস্টার তিনি।[৬] লেখকের দাদু হেডমাস্টারের পদ গ্রহণ করলে দাদুর জায়গায় তাঁর পিতা 'অডিটরের' চাকরিতে বহাল হন। রেলের মালপত্র কেনাবেচা ও শ্রমিকদের মাইনে পত্তরের হিসাব রাখার কাজ করতে হত তাঁকে।

খড়্গপুরে রেলের কারখানা নির্মাণের কাজ তখন পুরোদমে চলছে (১৮৮৯ খ্রিঃ)।[৭] কিন্তু শ্রমিকের বড় অভাব। সাহেবরা শ্রমিকের সন্ধানে জিপে করে মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত। কিন্তু তখনকার জমিদাররা সাহেবদের অধীনে কাজ করাটা অপমান মনে করতেন। তাই শ্রমিকদের রেলের কারখানার কাজ করতে দিতেন না। সামন্ততান্ত্রিক নির্দেশ অমান্য

করতে না পেরে বাঙালি শ্রমিকরা কাজ করতে আসত না। কাজেই বাঙালি শ্রমিক না পেয়ে সাহেবরা ওড়িশা ও অন্ধ্রের মূলত শ্রীকাকুলাম জেলা থেকে প্রচুর শ্রমিক নিয়ে এলেন। খড়্গপুর হয়ে উঠল বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মিলনস্থল। এ যেন ভারতবর্ষেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ।[৮]

কথিত আছে খড়্গপুরের একেবারে পূর্ব প্রান্তে 'ইঁদা' নামক স্থানে যে শিবমন্দিরটি আছে তার নাম খড়্গেশ্বর শিবমন্দির। এই নাম থেকেই নাকি খড়্গপুর নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন বিহারের একটি ছোট সামন্তরাজার জমিদারির নাম ছিল খড়্গপুর। তিনি আদিবসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও খড়্গেশ্বর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন, আর এলাকার নাম রাখেন খড়্গপুর।[৯] আবার মতান্তরে জানা যায় 'খ ড় গ' নামের এক আদিবাসী গোষ্ঠীদের নাম থেকেই খড়্গপুর নাম হয়েছে। যাইহোক, খড়্গপুরে আগে লোকবসতি তেমন গড়ে ওঠেনি। ছিল প্রচুর আদিবাসী, সাঁওতাল, শবর, মুণ্ডাদের বাস। চারিদিকে অপার শাল-মহুয়ার বন। কৃষ্ণচূড়ার শাখে শাখে মঞ্জরি। রেল কারখানা গড়ে উঠলে এই খড়্গপুরের চেহারা অনেকখানি বদলে গেল।[১০] প্রকৃতির নির্জনতার মাঝখানে নানা ভাষাভাষী, ধর্ম ও রীতিনীতির মানুষের সংমিশ্রণে এ যেন এক অন্য জগৎ—

> *রেলের সেই উপনগরী তখনো প্রকৃতির কোলে আধ-ফোটা শহর। বনজঙ্গল কেটে শক্ত পাথুরে জমিকে যতখানি সম্ভব কেটে সমতল বানিয়ে শহর তখন হাত-পা ছড়িয়ে চারপাশের অনেকখানি অবধি জুড়ে বসেছে, জুড়ে বসেছে বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে যেমন ছোট ছোট স্মৃতির কৌটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে থাকে, তেমনি শহরটার এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল লুপ্ত দিনের অরণ্যের আভাস। পূব-পশ্চিমে অসংখ্য জোড়া জোড়া রেললাইন, তার একধারে চওড়া রাস্তা পরস্পরকে কাটাকুটি করে চলে গেছে, রাস্তার ধারে ধারে বিশাল গাছ, পাতার ফাঁক দিয়ে ভোর সূর্যের সিঁদুরে ছোপ গলে পড়ছে লাল মাটির রাস্তায়, দুপাশে ফুলের বাগানে ঘেরা বাংলো, বাংলোর সামনে সাহেব-মেমদের ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলে, আয়ারা প্যারাম্বুলেটর ঠেলে। তাই ওদিকটার নাম ছিল সাহেবপাড়া। ভয় ভক্তি আর ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে সবাই তাকাতো তার দিকে। আর রেললাইনের এপারটা ছিল একটা ক্ষুদে ভারতবর্ষ, এক একটা পাড়া যেন এক একটা প্রদেশ। জেলখানার পাঁচিলের চেয়েও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রেলের কারখানাটাই*

যেন সে শহরের হৃৎপিণ্ড। এদিকে অবিরাম ট্রেন চলাচল, শান্টিংয়ের আওয়াজ, শীতের রাতে হৃৎপিণ্ড কাঁপানো ইঞ্জিনের হুইস্‌ল। চাপ চাপ ধোঁয়া।[১১]

ছেলেবেলায় তাঁর হাতেখড়ি হয় নিতান্ত সাদামাটা ভাবে—

না, পুজো-আর্চা হয়নি, পুরুত ডাকা হয়নি, কী আশ্চর্য! স্রেফ সেই নানা রঙের উল বোনা মায়ের হাতেই বোনা আসন, যা প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একজোড়া থাকত। মেয়ের বিয়ের পর নতুন জামাইকে তোয়াজ করে খাওয়ানোর জন্য এবং বিরল ক্ষেত্রে মেয়েকেও সেই উলবোনা সম্মানের আসন দেওয়া হত, সে রকমই একটি আসনে বসিয়ে বাবা নিজেই আমার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। সেই পুরনো দিনের স্লেটের উপর স্লেট-পেনসিল দিয়ে অ আ লেখার চেষ্টা। তবে আমি লিখেছি বলে মনে হয় না। আসলে বাবার হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরা আমার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী হয়নো ওই স্লেট-পেনসিলের অগ্রভাগ ছুঁয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তখন মজার লেখা-লেখা খেলা। কে একজন বলেছিল, এখন তো হাসছ, পরে বুঝবে ঠ্যালা। তার ভবিষ্যদ্বাণী যে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে জানত! ওই খেলাই কিনা শেষ অবধি জীবন এবং জীবিকা হয়ে দাঁড়ালো।[১২]

ছেলেবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল তিমু। একদিন তাঁর বাবা তাঁকে দাদুর স্কুলেই ভর্তি করিয়ে দিলেন। স্কুলের খাতায় তাঁর নাম হল *রমাপদ চৌধুরী*।[১৩]

রমাপদ-র বাবা ছিলেন বিজ্ঞানের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। উনিশ শতকেই যে পরিবারে ছ-ছজন স্নাতক সেই সুশিক্ষিত পরিবারের উত্তর পুরুষ ছিলেন তাঁর বাবা। এম.এস.সি পরীক্ষার ফল বেরনোর আগেই দিল্লিতে অধ্যাপনার মত সম্মানের চাকরি ছেড়ে তিনি গ্রামে গিয়ে দু বছর কৃষিকর্মে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য শেষ অবধি তাঁকে জীবনের প্রয়োজনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকরি নিতে হয়েছিল। চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নাস্তিক। এ কথা আগেই জেনেছি, কারণ তাঁর হাতেখড়ির বর্ণনায় রমাপদ জানিয়েছেন কোন পুজোআর্চা বা পুরুত ডাকা হয়নি।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর পিতামহকে দেখেন নি। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে তাঁর পিতামহ সম্পর্কে যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় :

আমার ঠাকুরদা ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করেননি। কারণ, আমার জন্মের আগেই তিনি গত হয়েছিলেন। তবু তাঁর একমাত্র গুণগ্রাহী আমার পিতৃদেবের মুখে শুনে শুনে

তাঁর একটি ছবি আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। তিনি গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষি মানুষ ছিলেন, বিবাহসূত্রে প্রচুর ভূসম্পত্তি যৌতুক পেয়ে আদি গ্রাম ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে বসবাস শুরু করেন। যদিও ঘরজামাই হয়ে নয়। তিনি পৃথক বাড়ি করে সংসার পাতেন। অর্থাৎ শ্বশুরের সম্পত্তি ভোগে তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়নি। কিন্তু শ্বশুরের গৃহে জীবন যাপনে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। বাবার কাছে শুনেছিলাম, তিনি নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, আদ্য মধ্য উত্তীর্ণ হয়ে কাব্য যৎকিঞ্চিৎ পড়েছিলেন। ইংরেজি বিন্দুমাত্র জানতেন না। অথচ আইন বা সরকারি বিষয়গুলি প্রতিবেশীদের জলের মতো বুঝিয়ে দিতেন শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়। ভুল উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি তাঁকে।[১৪]

তাঁর পিতামহের নেশা ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যগত ধানবীজকে বছরের পর বছর চাষ করিয়ে সেগুলিকে রক্ষা করা, সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ধান উৎপন্ন করা। তিনি প্রায় তিরিশটি জাতের ধান উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন।[১৫]

রমাপদ-র পিতার জীবনে রমাপদ-র দাদামশায়ের প্রভাব ছিল অপরিমেয়। লেখক তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুল সম্পর্কে জানিয়েছেন—

আমার এখনও বিস্ময় জাগে সেই সুদূর আঠারো শতকে যখন কিনা সবে রেললাইন পত্তন হয় এদেশে, তখন রীতিমত ভূস্বামী পর্যায়ের দু'টি পরিবার অন্নাভাব না থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ছেলেদের শিক্ষিত করার জন্যে মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে যেতে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরী প্রভাবে? দাদামশায়ের মুখে শুনেছি তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেই কলেজেরই নাম পরে হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যাসাগর কলেজ। বিদ্যাসাগরের প্রভাবের ফলেই কিনা জানিনা, তাঁরা কয়েকজন বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিয়েতে কোনও পণ নেবেন না। যথারীতি দাদামশাই তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। শুধু তাই নয়, বাবার মধ্যেও এই আদর্শ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। আমার ছাত্রাবস্থাতেও, তখন ইউনিভার্সিটিতে এক বন্ধুকে গর্ব করে বলতে শুনেছি বিয়ে করে কত টাকা পণ পেয়েছে, কত ভরি সোনা। চাকরি না